সুয়েজ খাল বিতর্ক (Suez Canal Crisis)

১৯৫৬ সালের জুলাই মাস নাগাদ নাসেরের নেতৃত্বাধীন মিশরের সঙ্গে ইজরায়েল ও তার সমর্থক ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরোধ প্রকাশ্যে আসে সুয়েজ সংকটকে কেন্দ্র করে। এই সংকটের মূলে ছিল মিশরের আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ সম্পর্কিত বিতর্ক। নাসের ক্ষমতায় এসে মিশরের কৃষি-অর্থনীতি ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের স্বার্থে ১৪০০ মিলিয়ন ডলারের আসওয়ান বাঁধনির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেন। মার্কিন প্রশাসন, ব্রিটেন ও ফ্রান্স শুরুতে ঐ বাঁধনির্মাণে মিশরকে আর্থিক ঋণদান করার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তী সময়ে নাসেরের কমিউনিস্ট সংসর্গ ও তীব্র ইজরায়েল-বিরোধিতার কারণে তা দিতে অস্বীকার করে (২০ জুলাই, ১৯৫৬)। এই ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে নাসের বিকল্পপথের অনুসন্ধানে নামেন। ২৬ জুলাই তিনি বিশ্বকে হতচকিত করে মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণের কথা ঘোষণা করেন এবং জানান এই জলপথ মিশরের জাতীয় সম্পত্তি। এর ফলে ঐ আন্তর্জাতিক মানের জলপথ থেকে ব্রিটিশ-ফরাসি কোম্পানিগুলির বিশাল মুনাফার উৎস বরাবরের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সুয়েজ খাল থেকে অর্জিত রাজস্ব ব্যয় করে নাসের আসওয়ান বাঁধ তৈরির কথা ঘোষণা করেন। অবশ্য তিনি একই সাথে জানান যে সুয়েজ খালের পূর্বতন ব্রিটিশ ও ফরাসি অংশীদার কোম্পানিগুলি বাজারমূল্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবে। বলাবাহুল্য, এটি ছিল এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত।

নাসেরের এই বৈপ্লবিক উদ্যোগে ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রমাদ গুনল। তারা মিশরের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। উইলফ্রিড ন্যাপ[৪৭]-এর ভাষায়, 'প্রধান প্রধান পশ্চিমি শক্তিগুলির কাছে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ এক ভীতিপূর্ণ সতর্কবার্তা বয়ে আনল এবং তারা নাসেরের এই দুঃসাহসী কাজের প্রতিবাদ করে সক্রিয় বিরোধিতায় অবতীর্ণ হল'। এই ঘটনায় ব্রিটেন সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল কেননা সুয়েজ খাল দিয়ে তার জাহাজই বেশি চলাচল করত এবং সুয়েজ খাল কোম্পানির শতকরা ৪৪ ভাগ শেয়ার ছিল তার। রুষ্ট ব্রিটিশ সরকার নাসেরকে উচিত শিক্ষা দিতে মিশরের বিরুদ্ধে সামরিক

Scanned with CamScanner

অভিযান চালানোর প্রস্তুতি নিতে শুরু করল। ব্রিটেনের রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি এডেন নাসেরকে 'হিটলার-মুসোলিনির পরবর্তী সংস্করণ' বলে তুলে ধরেছিলেন। ব্রিটেনের শ্রমিকদলের উদীয়মান নেতা Hugh Gaitskell জানালেন যে ১৯৩০-এর দশকে হিটলার-মুসোলিনিকে তোষণ করে ব্রিটেন যে ভুল করেছিল, নাসেরের ক্ষেত্রে তা করা হবে না। সুয়েজ খাল প্রশ্নে মার্কিনি স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না-থাকায় আমেরিকা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই প্রশ্নের মীমাংসা করতে চেয়েছিল যদিও তার নীরব সমর্থন ছিল পশ্চিমি শক্তিদ্বয়ের প্রতি।

যুদ্ধের সূচনা (Commencement of the War)

ব্রিটেন ও ফ্রান্স এবং তাদের সহযোগী ইজরায়েল আর কালবিলম্ব না-করে মিশরকে আঘাত হানতে উদ্যত হল। এই ত্রিশক্তি অতঃপর মিলিতভাবে ১৯৫৬ সালের ২৯ অক্টোবর মিশরকে আক্রমণ করে বসে। ইঙ্গ-ফরাসি বিমানবাহিনী মিশরের পোর্ট সৈয়দ-এর ওপর নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করলে দ্বিতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ইজরায়েল-এর সেনাবাহিনী স্থলপথে সিনাই মরুভূমির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল। কার্যত, মিশরের ওপর এই জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল—'The attack caused an outcry from the rest of the world'.[৪৮] ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি এই আক্রমণকে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিস্তারের নির্লজ্জ নজির হিসেবে চিহ্নিত করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি কারণে এই যুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিল : (১) ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে আসন্ন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রেক্ষিতে সে বাড়তি কোনো ঝুঁকি নিয়ে চায়নি, (২) অন্যদিকে, সে আশঙ্কা করেছিল যে তার জড়িয়ে পড়া আরব দুনিয়াকে জোট বাঁধতে সাহায্য করবে এবং তেমন হলে প্রতিপক্ষ সোভিয়েত রাশিয়ার অংশগ্রহণও অনিবার্য হয়ে উঠবে। কিন্তু তার নৈতিক সমর্থন ছিল ন্যাটো জোটভুক্ত উপরোক্ত ত্রিশক্তির প্রতি।

যুদ্ধের প্রথমদিকে আক্রমণকারী ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইজরায়েল মিশরের বিরুদ্ধে কিছুটা সামরিক সাফল্য পেলেও তা ক্ষণস্থায়ী ছিল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাদের অনুকূলে ছিল না। ক্রমশ এই যুদ্ধ ইজরায়েল ও তার পশ্চিমি মিত্রদের বিরুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্যের সমগ্র আরবজাতির প্রতীকী যুদ্ধে পরিণত হল। আরব দেশগুলিতে মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান গামাল নাসেরের পক্ষে এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে সহানুভূতির জোয়ার দেখা দিয়েছিল। আরব জাতীয়তাবাদ এই পরিস্থিতিতে নতুন উদ্যমে পশ্চিম এশিয়াকে প্লাবিত করেছিল। ইরাক থেকে সিরিয়ার মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে যে তেলের পাইপ

Scanned with CamScanner

লাইন ইউরোপে গিয়েছিল এই যুদ্ধের সময় তা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এরূপ উত্তাল পরিস্থিতিতে রুশ রাষ্ট্রপ্রধান ক্রুশ্চেভ হুমকি দিলেন যে মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ না হলে আক্রমণকারী শক্তিগুলির ওপর সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র প্রয়োগ করা হবে। একসময় কানাডার প্রধানমন্ত্রী লেস্টার পিয়ার্সন যুদ্ধ বন্ধ করতে রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপের দাবি জানান। অন্যদিকে দুই সুপার পাওয়ার, আমেরিকা ও সোভিয়েত রাশিয়াও পশ্চিম এশিয়ায় শান্তিস্থাপনের ওপর জোর দেয়। তাদের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীকে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। বস্তুত, বিশ্ব-জনমতের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে শেষপর্যন্ত আক্রমণকারী রাষ্ট্র তিনটি পিছু হটে এবং মিশর থেকে সেনাপ্রত্যাহার করতে সম্মত হয়। সাথে সাথে রাষ্ট্রপুঞ্জের শান্তিবাহিনী মিশর-ইজরায়েল সীমান্তে দখলীকৃত এলাকায় প্রহরার কাজে নিযুক্ত হয়। অবশেষে, দ্বিতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

যুদ্ধের ফলাফল ও তাৎপর্য (Consequences and Significance of the War)

১৯৫৬ সালের দ্বিতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের তাৎপর্য ছিল সুদূরপ্রসারী। **প্রথমত**, এই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আরব রাজনীতিতে মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান নাসেরের মর্যাদা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি আরব জাতীয়তাবাদীদের কাছে বীরের সম্মান ('আধুনিক সালাদিন' উপাধি) অর্জন করলেন। আন্তর্জাতিক দুনিয়া মিশরের সুয়েজ খাল জাতীয়করণকে স্বীকৃতি দিল। নাসের বিচক্ষণতার সঙ্গে ইজরায়েল ব্যতীত সব রাষ্ট্রকে সুয়েজ খাল ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। তাঁর উদ্যোগে একসময় মিশর ও সিরিয়া ঐক্যবদ্ধভাবে 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' গঠন করল (১৯৫৮ সাল)।

দ্বিতীয়ত, সুয়েজ সংকট ও তার পরিণতিতে সংঘটিত দ্বিতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের শেষে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের চূড়ান্ত ক্ষতি ও মর্যাদাহানি হয়েছিল। ব্রিটেনের এই হঠকারী আগ্রাসনবাদী কাজ মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশই মেনে নিতে পারেনি। ইরাকের সঙ্গে তার বহু পুরোনো সম্পর্ক এখন নষ্ট হল। ব্রিটিশপন্থী ইরাকি প্রধানমন্ত্রী নুরি-ইস সৈয়দ ১৯৫৮ সালে আরব গেরিলাদের হাতে নিহত হন। এই ঘটনার পর থেকে দুর্বল ব্রিটেন আরও বেশি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। ফ্রান্সের অবস্থাও শোচনীয় হয়েছিল। ফরাসি উপনিবেশ আলজিরিয়ায় অতঃপর ফ্রান্স-বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম জোরদার হল এবং ১৯৬২ সালে আলজিরিয়া শেষ অবধি স্বাধীনতা লাভ করল। এর পরিণতিতে এককথায়, মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমি ঔপনিবেশিকতার চূড়ান্ত অবসান ঘটল।

তৃতীয়ত, সুয়েজ যুদ্ধ অবশ্য বৃহত্তর আরব-ইজরায়েলি সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ইজরায়েলের বেশ কিছুটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল যা পূরণ করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। কিন্তু যুদ্ধে ইজরায়েল তার সামরিক উৎকর্ষের প্রমাণ

Scanned with CamScanner

রেখেছিল। এখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। শত্রু আরব রাষ্ট্রগুলির মোকাবিলায় ইজরায়েল অতঃপর পশ্চিমি সাহায্যের ওপর আলাদাভাবে আমেরিকার ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

চতুর্থত, মধ্যপ্রাচ্য সংকট তথা এই আরব-ইজরায়েল যুদ্ধ থেকে পুরো ফায়দা তুলে নিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। পশ্চিম এশিয়ায় এখন থেকে তার প্রভাব বাড়তে থাকে এবং আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষে নৈতিকভাবে আরবদের পাশে থাকায় সোভিয়েত রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে তার মর্যাদার আসন স্থায়ী করে নিয়েছিল। সোভিয়েত সাহায্য নিয়ে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের অতঃপর তাঁর অসমাপ্ত কাজ আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ সম্পূর্ণ করেছিলেন।

পঞ্চমত, সুয়েজ সংকট আমেরিকাকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল। আরব-ইজরায়েল যুদ্ধে ন্যাটো জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলির শক্তিহীনতা যেমন প্রকাশ্যে এল তেমনি ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত বাগদাদ চুক্তিও অকার্যকর হয়ে পড়ল। এসব সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাববৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইজেনহাওয়ার কর্তৃক ১৯৫৭ সালের ৫ জানুয়ারি ঘোষিত হয়েছিল 'আইজেনহাওয়ার নীতি'। এসবের পরিণতিতে মধ্যপ্রাচ্যের মাটিতে ঠান্ডা লড়াই-এর প্রসার ঘটে চলল।

সর্বোপরি, দ্বিতীয় আরব-ইজরায়েল যুদ্ধের সূত্র ধরে আরব দুনিয়ায় বেশকিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে চলেছিল যেমন প্যালেস্টাইনের আরব গেরিলা নেতা ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে PLO (Palestine Liberation Organisation) বা প্যালেস্টাইন মুক্তি মোর্চা গঠন (১৯৬৪ সাল), ইরাকে শাহীতন্ত্রের অবসান ও সমাজবাদী বাথ পার্টির ক্ষমতালাভ ইত্যাদি। এসবই আরব রাজনীতিকে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল।

Scanned with CamScanner